মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে ১৯৬৭ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করি। মেডিকেল কলেজে ইন্টার্ন শেষ করে আমি সরকারি চাকরিতে যোগদান করি। আর সান্না সরকারি চাকরি করবে না বলে বগুড়া শহরের প্রধান সড়ক (রংপুর রোড) ২নং রেল ঘোমটির দক্ষিণ-পূর্ব পাশে নিবেদিতা চিকিৎসালয় খুলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে। ১৯৭৪ সালে আমি ফরাসি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্মরোগ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যাই। আর সান্না সৌদি সরকারি চাকরি নিয়ে সৌদি আরব চলে যায়। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পরে আমি আবার সিলেট মেডিকেল কলেজে সরকারি চাকরিতে যোগদান করি। প্রায় ১০ বছর সেখানে চাকরি করার পরে ঢাকায় আইপিজিএমআর (বর্তমান বিএসএমএমইউ) এ চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগে বিভাগীয় প্রধান ও চেয়ারম্যান হিসেবে চাকরিজীবন শেষ করি। সান্না সৌদি আরব থেকে ফিরে আসার পর আমাকে বলল আমি আরো লেখাপড়া ও ব্যবসা করতে চাই। আমি বললাম ব্যবসাও করবা আবার পড়াশোনাও করবা এ কেমন কথা। উত্তরে সে বলল, তোমরা সবাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেছো। আমার খুব শখ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নেয়ার। পরবর্তীতে সে সত্যি সত্যিই ২০০৭ সালে ইন্সটিটিউট অব ফুড এন্ড নিউট্রিশন সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরীরের মেদ, হৃদযন্ত্রের ক্ষতিকারক এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে।

রিয়েলএস্টেট ব্যবসায়ী হিসেবে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সান্না ছিল ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে সে আবাসিক-বাণিজ্যিক বহু ভবন নির্মাণ করেছে। তার আরেকটি ইচ্ছা ছিল-ঢাকা শহরে সে সবচেয়ে উঁচু ভবন নির্মাণ করবে। এই লক্ষ্যে ঢাকার মালিবাগে ৪২ কাঠা জমির উপর T.A Tower নামে ৪৫ তলাবিশিষ্ট একটি স্থাপনার কাজ শুরু করে, যা এখনও নির্মাণাধীন রয়েছে। শিবগঞ্জ কল্যাণ সমিতি নিয়ে তার অনেক আশা ছিল যার মাধ্যমে শিবগঞ্জ এলাকাবাসীর জন্য কল্যাণমূলক কাজ ও সেবা করা। এ ব্যাপারে তার অনেক ইচ্ছা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিল। গত ৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সে এই দুনিয়া ও আমাদের সবাইকে ছেড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সান্না আমাদের মাঝে নেই কিন্তু শিবগঞ্জ কল্যাণ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তার অবদান ও সমিতিকে কেন্দ্র করে তার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকবে। সমিতি ঘিরে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। সান্নার মৃত্যুর আগে গত ১৯ জুলাই, ২০২৩-এ তার সহধর্মিণী ডা. সানজিদা আক্তার মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুজনকেই বেহেশত দান করুক এই কামনা করছি। সান্না ও তার স্ত্রী মৃত্যুকালে এক ছেলে, দুই মেয়ে ও কয়েকজন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তার ছেলে বর্তমানে ট্রপিক্যাল হোমস লিমিটেডের চেয়ারম্যান। আমি এই পরিবারের সার্বিক উন্নতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

তারা দুই বন্ধু আমাদের প্রেরণা

প্রকৌঃ মো. রফিকুল ইসলাম
(সহ সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক)
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

তারা দুই বন্ধু। পরানের দোস্ত। কলেজ জীবন থেকে তাদের বন্ধুত্ব। দুজনই ডাক্তার। মানবসেবার ব্রত নিয়ে দুই বন্ধুর যে পথচলা তা এখন আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার গল্প। একজন তো প্রকৌশলী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতার স্বপ্ন পূরণে বাধ্য হলেন ডাক্তারি পড়তে। মনে কষ্ট ছিল, ক্রোধ ছিল। পরে অবশ্য সে ক্রোধ রহিল না। তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাজীবন শুরু করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চিকিৎসাসেবাকেই জীবনের প্রধান এবং একমাত্র পেশা হিসেবে বেছে নেন। নিজেকে একজন সহানুভূতিপ্রবণ চিকিৎসক, সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। চাকুরির সুবাদে বুঝতে পারেন পিতার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। কারণ এই পেশায় ধনী গরিব-দুঃখী, অসহায় সব শেণির মানুষের সেবা করা যায়। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি মানুষের নিকট একজন স্বনামধন্য ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতায়, যোগ্যতায় এবং সুনামের সংগে চর্ম ও যৌন বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

হ্যাঁ, আমি বলছি আপনাদের সবার পরিচিত অধ্যাপক ডা. এ জেড এম মাইদুল ইসলামের কথা। বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ময়দানহাটা গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে তাঁর জন্ম। মরহুম ডা. মহিউদ্দিন আহম্মেদ ও মরহুমা পরমা খাতুনের পরিবারের ষষ্ঠতম পুত্র সন্তান। তার একমাত্র ছেলে কানাডা প্রবাসী। তিনিও একজন খ্যাতিমান ডাক্তার। আমরা যারা তাঁর অনুরক্ত এবং ভক্ত, যখনই ফোন দিয়ে কোনো রোগীকে পাঠিয়েছি, তিনি তাকে অতি আপনজন মনে করে শত ব্যস্ততার মধ্যেও চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। এটাই মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ও সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, নিয়মানুবর্তী, সৎ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগে রেজিস্ট্রার পদে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭৪ সালে ফরাসি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে প্যারিস ইউনিভার্সিটি থেকে কুষ্ঠ, চর্ম ও যৌন রোগ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি বিসিপিএস কর্তৃক এফসিপিএস ডিগ্রি, প্যারিস অবস্থিত পাসটিউর আল ফ্রেড ফুরনিয়া ইনস্টিটিউট, বিসাত হাসপাতাল ও নেকার হাসপাতাল থেকে মেডিকেল মাইক্রোলজি, এইডস ও যৌন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে ঢাকা মেডিকের কলেজে চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর বিএসএমএমইউতে চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত বিভাগে বিভাগীয় প্রধান ও চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ডারমাটোলজি সোসাইটি, সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ডারমাটোলজিস্টের আজীবন সদস্য। আমেরিকান একাডেমি ডারমাটোলজি, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ডারমাটোলজি ও কানাডিয়ান ডারমাটোলজি, অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক সদস্য। চাকরি করাকালীন তিনি কুষ্ঠ, চর্ম, যৌন রোগ ও আর্সিনিক সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা পরিচালনা করেন। তার অর্ধ শতাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন মেডিকেল জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি আনোয়ার খান মর্ডাণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক ডা. এজেডএম মাইদুল ইসলাম সমিতি গঠনে একজন অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেন সমিতি গঠনের পর সামাজিক নানাবিধ অস্থিরতার (কোভিড, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ) মধ্যে বিগত সময়ে আমরা সীমিত আকারে হলেও অনেক সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পেরেছি। আপনাদের সার্বিক হযোগিতায় আগামীতে আরো বড় পরিসরে কাজ করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেন, সমিতির উন্নয়নে এলাকার গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্প্রসারণে সহযোগিতা এবং তরুণ প্রজন্মের মেধা বিকাশে শিক্ষা ট্রাস্ট গঠন, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদানে চিকিৎসা সেল গঠন। এলাকার কর্মক্ষম উদ্যম ও পরিশ্রমী মানুষদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। এ জন্য সমিতির চালিকাশক্তি হিসেবে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এলাকার প্রবীণ নবীণ এবং তরুণ প্রজন্মকে সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমিতির যে কোনো মহৎ উদ্যোগ এবং উন্নয়নে আমার চেষ্টা, পরিশ্রম এবং সহযোগিতা অব্যাহত আছে এবং থাকবে।

অপরজন আপনাদের পরিচিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক ডা. মো. রেজাউল করিম সান্না, চেয়ারম্যান ট্রপিক্যাল হোমস লি. এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিবগঞ্জ উপজেলা(বগুড়া) কল্যাণ সমিতি। বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার নিমেরপাড়া গ্রামে তার পৈতৃক বাড়ি। সাত ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি ২য়তম সন্তান। তার এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে বিদেশ (অস্ট্রেলিয়া) থেকে লেখাপড়া শেষ করে তারই প্রতিষ্ঠানে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এবং ছোট মেয়ে সুইডেন প্রবাসী।

ডাক্তারি পাস করে চাকরি নিয়ে বিদেশ (সৌদি আরব) গেলেন। কয়েক বছর পর ফিরে এসে তার মানস পটে চিন্তা হলো বাংলাদেশ একটা জনবহুল দেশ। এ দেশে মানুষের বাসস্থানের সমস্যা প্রকট। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরে আগামীতে জনসংখ্যা বৃদ্বির সাথে সাথে এ সমস্যা আরো প্রকট হবে। তিনি অনুভব করলেন বহু মধ্যবিত্ত পরিবার নির্মিত বাড়ি কিনতে চাইবে। অনেক ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান অফিসের জন্য ভবন/ফ্ল্যাট ভাড়া অথবা কিনতে চাইবে। যদি তা পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা যায়। তাই তিনি এবং তিন বন্ধু মিলে ট্রপিক্যাল হোমস লি. নামে ডেভলেপার কোম্পানি গঠন করেন এবং তার মাধ্যমে ঢাকা শহরে অভিজাত এলাকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জমি কিনে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেন। নির্মাণ করলেন শত শত স্থাপনা। তার নির্মিত অনেক স্থাপনায় আধুনিকতার ছোয়া বিরাজমান। নির্মিত ভবন/স্থাপনা সাশ্রয় মূল্যে এককালীন অথবা কিস্তির মাধ্যমে বিক্রয় শুরু করলেন। অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপক সুনাম অর্জন করলেন। অনেক অফিস এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো। কর্মসংস্থান হলো শত শত মানুষের। সে সময় এ ব্যবসা চালানো সহজ ছিল না। দক্ষ কারিগর, কর্মী এবং কাঁচামালের অভাব ছিল। তার চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি জানতেন সুদূরপ্রসারী চিন্তা, পরিকল্পনা ছাড়া বৃহত্তর কিছু অর্জন করা যায় না। তাই দৃঢ় প্রত্যয় ও ঝুঁকি নিয়ে তার পথচলা। নির্মাণ কাজে তার প্রচণ্ড আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল। কাজের মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন। অনেক সমস্যা মোকাবিলা করে অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সংগে কাজ করে আজ একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তার সুযোগ্য পরিচালনায় এই ১ম বারের মতো ঢাকা শহরের আর্কষণীয় স্থান মালিবাগ মোড়ে অত্যাধুনিক ৪৫তলা বিশিষ্ট বিশাল ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

তিনি একজন সমাজসেবক হিসেবে অসহায়, দরিদ্র বিশেষ করে গরিব এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারে তার প্রচণ্ড আগ্রহ। অবসর সময়ে বই পড়া তার অভ্যাস। ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিধি অনেক। তিনি একজন ভালো বক্তা এবং আবৃত্তিকারও বটে। তার বক্তৃতা,আবৃত্তি দর্শকেরা মনোমুগ্ধ হয়ে শোনেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তিনি সেবা ও কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেন। ৩০ নভেম্বর ২০১৮ আমি মো. রফিকুল ইসলাম আ. আলীম, প্রকীঃ সুমন এবং ড. কাজী মো. এমদাদুল হক সাহেবকে নিয়ে শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা গঠনের প্রাক্কালে তাদের দুজনের সংগে আমার পরিচয়। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডা. মো. রেজাউল করিম সে সময় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন এই সমিতি শিবগঞ্জের মানুষের মধ্যে এক অপরূপ মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে, শিবগঞ্জের মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলে কাজ করছে। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ শিবগঞ্জ গড়ে তুলতে সমিতি চেষ্টা করে যাচ্ছে।

শিবগঞ্জের ইতিহাস-ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই গৌরবোজ্জল ইতিহাসের সংগে তরুণ প্রজন্মকে পরিচয় করে দিতে হবে। শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার পাশাপাশি এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের উন্নতর পেশায় উত্তরণে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা দরকার। তিনি বলেন, আমি শুরু থেকে সবসময়ই সমিতির সংগে আছি এবং থাকব। আমি শিবগঞ্জের মাটি ও মানুষের প্রতি আবেগ আপ্লুত। সমিতির সকল মহৎ আয়োজনে আমার সার্বিক সহযোগিতা ও শুভকামনা অব্যাহত আছে এবং থাকবে বলে আমার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সমিতির উন্নয়নে অনেক সময় তাদের সংগে আমার আলাপ হয়। সমিতি তথা এলাকার উন্নয়নে তারা দুইবন্ধু খবুই নিবেদিতপ্রাণ। তাদের দুজনের নিরলস প্রচেষ্টা, সহযোগিতায় কার্যনির্বাহী পরিষদ, উপদেষ্টামন্ডলী, সাধারণ সদস্য এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকায় সমিতির একটা স্থায়ী অফিস এবং আগামী ৪/৫ বৎছরের মধ্যে সমিতির একটা নিজস্ব ভবন এর কাজ এগিয়ে চলছে। এটাই হবে সমিতির স্বপ্ন পূরনের প্রথম এবং প্রধান ধাপ।

তাদের দুইবন্ধু নিয়ে আমার এ লেখার উদ্দেশ্য হলো সমিতির উন্নয়নে তাদের মধ্যে যে বোঝাপড়া এবং সর্বক্ষেত্রে একসংগে কাজ করার যে আকাঙ্খা, আগ্রহ এবং প্রত্যাশা তা সাধারণত দেখা যায় না। তাদের কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল সফলতা এবং সমাজসেবায় যে অবদান তা শুধু প্রশংসনীয় নয় অনুপ্রেরনারও উৎস। তাই আমি মনে করি নবীন, তরুণ প্রজন্ম এই গুণীজনদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বাড়বে এবং তারা নিজেরা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে। আমি আশা করি তাদের চেষ্টা এবং সহযোগিতায় সমিতির উন্নয়ন এবং অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হবে। তবে আমাদেরকে সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের সাথে থাকতে হবে।

ডা. এজেডএম মাইদুল ইসলাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ডা. মো. রেজাউল করিম সান্না প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের অবদানের জন্য সমিতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সমিতিতে আরো অনেক হিতাকাংখী এবং গুনীজন আছেন পরবর্তিতে তাদের নিয়ে লেখার ইচ্ছা রইলো। আমার এ লেখার সময় গত ০৭ নভেম্বর-২০২৪ ইং বৃহস্পতিবার সময় ০৪ ঘটিকায় ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য ভক্ত এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাকে ভুলব না। মানবতার সেবক হিসেবে তিনি আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণার প্রদায়ী ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা একজন অভিভাবক হারিয়েছি। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

সমিতি যেন একটি রাষ্ট্র

মো. হাসেমুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

প্রাচীন এথেন্সে রাষ্ট্রের নাগরিকরা হাট-বাজারে সমবেত হয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। কিন্তু আজ কোটি কোটি নাগরিকের আধুনিক রাষ্ট্রে, আধুনিক সমাজে সেটি সম্ভব নয়। এই বাস্তবতায়, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ফলপ্রসূ উৎস হচ্ছে পার্লামেন্ট, সচিবলায়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এই রাষ্ট্রের গল্প হচ্ছে মানুষের গল্প। মানুষের গল্প হলো আপনার গল্প, আমার গল্প, আমাদের গল্প। আর তাই এ গল্প শুধুই শোনাবার গল্প নয়। কেননা আমরা আজকে যা করব, যে পথে এগোবো, আগামীকাল তাই মানুষের গল্পে নতুন পরিচ্ছদ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যদি আজ এগিয়ে চলি, তাহলে এগিয়ে চলবে মানুষের গল্প। আমরা তাই, গল্প শোনাবার জন্যে চুপটি করে ঘরের কোণে বসে থাকব না। এগিয়ে আসবো কোমর বেঁধে, আওয়াজ তুলবো: বাংলাদেশে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে। মানুষের গল্প আমাদের সকলের গল্প। যে গল্পের নায়ক আপনি, আমি, আমরা সবাই।

মানুষের নতুন গল্পের অংশীজন হচ্ছে-'শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি'। এটি কেবলই একটি গতানুগতিক সমিতি নয়। এটা শিবগঞ্জবাসীর ভ্রাতৃভাবের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের স্বপ্ন। শিবগঞ্জ কল্যাণ সমিতির যাত্রাই শুরু হয়েছে স্বপ্নের সমান বড়ো হবার জন্য। কিন্তু সেই স্বপ্নের বাড়ি পৌঁছাবো কেমন করে? উত্তর হচ্ছে: সমিতির মজবুত কাঠামো নির্মাণ আর আমাদের সৃজনশীল কার্যক্রম। তার মানে সবাই মিলে একজোট হতে হবে, একজোট হয়ে সত্য সন্ধানে লড়তে হবে। আমরা যদি একজোট হতে পারি তাহলে তার শক্তি কী দুর্বার হয়ে দাঁড়ায় তা কল্পনারও অতীত। ঘরের কোণ থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলবো: মানবিক মূল্যবোধের ব্যতিক্রমী সংগঠন হিসেবে সারা দেশের আইডল হিসেবে উপস্থাপন করব 'শিবগঞ্জ কল্যাণ সমিতিকে'। 'শিবগঞ্জ কল্যাণ সমিতিই আমাদের স্বপ্নের বাড়ি।

মানুষের গল্প হলো পৃথিবী এবং দেশ জয় করার গল্প। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি-একজন মানুষ একটি দেশকে কতখানি জয় করতে পারে? দেশের কাছ থেকে কতটা জিনিস আদায় করতে পারে? এর জবাব খুব একটা সহজ নয়। কেননা জবাবটা অন্য জিনিসের ওপর নির্ভর করছে। সে জিনিসটার নাম হলো হাতিয়ার। এই হাতিয়ার যুদ্ধাস্ত্র নয়, হাতিয়ার হলো চিন্তা-চেতনা-আদর্শ এবং দর্শন। হাতিয়ারটা যদি নেহায়েত বাজে ধরনের হয়, তাহলে তাই দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে একজন মানুষ দেশের কাছ থেকে বড়জোর এতটুকু জিনিস আদায় করতে পারব, যা দিয়ে কোনো মতে নিজের জানটুকু বাঁচবে কিন্তু হাতিয়ারটা খুব ভালো হয়। তাহলে একজন মানুষের পক্ষে দেশকে জয় করতে পারা যায় তত বেশি করে তত ভালো করে। দিনের পর দিন মানুষের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-দর্শন অনেক উন্নত হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে। আমরা বাঙালিরাও সেই হাতিয়ার দিয়েই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ জয় করেছি।

ব্রিটিশ আমলে একজন বিখ্যাত বাঙালি সাংবাদিক বলেছিলেন : 'দুইজন ইংরেজ একত্রিত হলে গড়ে তোলে ক্লাব বা সমিতি আর দুইজন বাঙালি একত্রিত হলে গড়ে তোলে দলাদলি'। কিন্তু আমরা শিবগঞ্জের মানুষেরা দলাদলিতে লিপ্ত হইনি। আমরা গড়ে তুলেছি একটা সমিতি। আমরা কাজ করছি মানুষকে নিয়ে মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য। সমিতির মাধ্যমে মানবকল্যাণ করতে গিয়ে আদর্শের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবশ্যই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে আমরা খুঁজে পেতে চাইবো কী দিয়ে মানুষের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠাকে প্রবল অনুরাগ ও ভালোবাসা দিয়ে বাঁধা যাবে, সংরক্ষণ করা যাবে এবং বিকাশিত করা যাবে। আমরা খুঁজে পেতে চাইবো, কোন উপায় অবলম্বন করলে মানুষের আবেগ-অনুভূতিগুলোকে এমন এক সন্তুষ্টির স্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে, যা তাদের সাধারণ জীবন-যাপনকে সমৃদ্ধ করবে। এটাই হলো 'শিবগঞ্জ কল্যান সমিতির' প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন।

ক্লাবের বাংলা হচ্ছে সমিতি। কেবল সমিতি গড়লে হবে না। সমিতির দর্শন হবে মানুষ, সম্পর্ক, প্রাণ-প্রকৃতি, রাস্তাঘাট, চা-স্টল, মিছিল, আড্ডা ও সংলাপ। একাগ্রতা নিয়ে সমিতি করা দরকার সমাজ এবং মানব কল্যাণে। অর্জন করতে হবে সামাজিক তত্ত্বজ্ঞান। যাপিত জীবন আজ নানা সংগতি ও অসংগতির সমিষ্টি। জ্ঞানের প্রতি যেন অযত্ন না হয়, মনোযোগের এবং দায়িত্ববোধের যেন ঘাটতি না পড়ে তা খেয়াল রাখতে হবে। মানুষ অভিজ্ঞতা প্রকাশে পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। মানুষের মুখের কথায় উঠে আসছে জীবনবোধের তীক্ষ্ণ নির্যাস। নানারকম আড্ডা থেকে কানে ভেসে আসে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্মম বিশ্লেষণ-যার উপসংহার হলো উন্নয়নের সুফল গেছে দলবাজ ক্ষমতাসীন এবং তাদের দলদাসদের ঘরে আর সাধারণ মানুষ পেয়েছে 'ছোবড়া'। সাধারণ মানুষ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। তখন এসব শ্লেষের মূল্য বোঝা অবশ্যই দরকার। সামাজিক পরিসর অভিজ্ঞতার ভান্ডার। এ ভান্ডার থেকে হীরা-জহরত চিনে নেয়া কঠিন নয়, কঠিন নয় চিন্তাসূত্রের সুলুক সন্ধান। চিন্তা মানেই চিনে চিনে চলা। যদি চিনতে না পারি তাহলে চলবো কেমনে, কীভাবে পথ দেখাবো বা দেখবো? শিবগঞ্জ সমিতির সংশ্লিষ্ট সকলকে হালনাগাদ জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্তি দরকার। দরকার বোঝাপোড়া। জগতখ্যাত দার্শনিক জ্যাঁ-জাক রুশো বলেছেন, 'পশুর সঙ্গে মানুষের অনেক দিক দিয়ে মিল থাকলেও পশুর একটা জিনিস নেই। আর তা হচ্ছে মানুষের আত্ম-উন্নয়নের শক্তি, যা পরিবেশের আনুকূল্যে বিকশিত হয়। আমরা এই মানুষরাই গড়ে তুলেছি শিবগঞ্জ সমিতি। এই সমিতিকে আমি একটি বড় রাষ্ট্রের ভেতর আরেকটা রাষ্ট্র মনে করছি। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে। একটা গঠনতন্ত্র বা সংবিধান আছে। তেমনি একটা সমিতিরও গঠনতন্ত্র আছে তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য। রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার যেমন নাগরিকদের দায়িত্ব পালন করে, তেমনি শিবগঞ্জ সমিতিও শিবগঞ্জবাসীর কল্যাণার্থে নানা রকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে এই সমিতির জন্মলগ্ন থেকে। সেজন্যই আমার এই লেখার শিরোনামে বলেছি-'সমিতি যেন একটি রাষ্ট্র'

সেবার মাধ্যমে আমি আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি পাই

আব্দুল আলিম
প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

প্রকৃতিতে এখন ঋতুরাজ বসন্ত। শীতের খোলস ছেরে ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে বৃক্ষরাজি। ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্র মুকুল। মৌমাছির গুঞ্জরী যেন সুরেলা সংগীত। প্রকৃতির এমনি এক অপূর্ব ক্ষণে শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি ঢাকা পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হৃদয়ের টানে, আত্মার বন্ধনে, সকলে একত্রিত হয়ে একদিন গ্রামের স্মৃতিচারণ, সত্যই আনন্দঘন পরিবেশ।

আপনাদের স্নেহ পেয়ে আমি বড়ই ধন্য। ২০১৭ সাল থেকে বিনা পারিশ্রমিকে এই সমিতিতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছি। নিষ্ঠুর পৃথিবী, মূল্যহীন এই সমাজে কাজের স্বীকৃতি কেহই দিতে চায় না। সকলেই মঞ্চে ওঠে নিজেদের গুণ গান গাইতে ব্যস্ত, তবুও কেন যেন মনে হয় এই সমিতি আমার, আমাদের, শিবগঞ্জ উপজেলাবাসির। পদ পদবি ক্ষণিকের কাহারো ওপরে রাগ করে থাকা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ মানুষের কল্যাণে থাকবে এটাই স্বাভাবিক, অনেক সময় মনে করেছি সমিতিতে শ্রম দিয়ে কী পেয়েছি? মনকে প্রশ্ন করলে উত্তরও পেয়েছি, শিবগঞ্জ উপজেলার মানুষের অগাধ ভালোবাসা, স্নেহ। আমার আশা ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি ঢাকার বুকে একটি আদর্শ সামাজিক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের মাঝে পরিচিত হয়ে থাকবে। যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ ও বৈষম্য। রাজনীতি যেন সংগঠনকে স্পর্শ করতে পারবে না। সকল মতাদর্শ মানুষ একত্রিত হবে হৃদয়ের টানে রক্তের বন্ধনে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মাঝে অনেক উৎসাহী উদ্যমী ও উদার মনের মানুষ আছেন তারা চাইলেই এই সমিতির উন্নয়নে অনেক কিছু করা সম্ভব। বিগত দিনে সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভায় সমিতির ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। আমি মনে করি সেগুলো বাস্তবায়ন হলে শিবগঞ্জ সমিতি সামাজিক সংগঠন হিসেবে এক অনন্য অবস্থান তৈরি করবে। তবে সমিতির জন্য আমি নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে কাজ করতে চাই। কারণ মানুষের কল্যাণে সামাজিক কাজ করার মাধ্যমে আমি আনন্দ ও সুখ অনুভব করি।

আপনারা জানেন আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। চাকরির ফাঁকে সময় বের করে সমিতির কাজ করার চেষ্টা করি। আমি সিডিএফ এর মাধ্যমে এলাকার বয়স্কদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি। সত্যিকার অর্থে কোনো লোভ,ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করি না। বরং এইসব সেবামূলক কাজের মাধ্যমে আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি পাই।

সমিতিতে কাজ করতে গিয়ে অনেক মুরুব্বির ভালোবাসা পেয়েছি, অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডা. রেজাউল করিম সান্না স্যারকে তিনি তার জীবন দশায় আমার সামাজিক কাজ করার উৎসাহ দেখে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়নে আমি অনেক দূর পর্যন্ত কাজ করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে এই কাজ অব্যাহত থাকবে। আমি স্যারের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, স্মরণ করছি সামসুজ্জোহা স্যার, জাহাঙ্গীর স্যার, ডাক্তার আমিনা খান ম্যাডাম, ডা. সানজিদা আক্তার, রুমানা গনি ম্যামকে, আমি উজ্জীবিত হই, অধ্যাপক ডা. এজেড এম মাইদুল ইসলাম স্যার যার উৎসাহে শতবার ভুল করার পরেও স্যার আমাকে আগলাইয়ে রেখেছেন আমি কৃতজ্ঞ ডাক্তার আবু বক্কর সিদ্দিক স্যারের প্রতি যিনি প্রতিদিন আমার খোঁজখবর রাখেন সমিতির বিভিন্ন কাজ করার উৎসাহ জোগান, ডক্টর কাজী মো. ইমদাদুল হক স্যার, আব্দুর রউফ স্যার, আবুল কালাম আজাদ স্যার, আব্দুল হামিদ স্যার, প্রকৌঃ রফিকুল ইসলাম আর অসংখ্য মুরুব্বি তাদের স্নেহে আমি সিক্ত। এবং এই সমিতির উপদেষ্টা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সকলকে আবারো শ্রদ্ধা জানাই।

আপনাদের অংশগ্রহণের সমিতির আজকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলনমেলা অত্যন্ত আনন্দঘন হয়ে উঠেছে। আমাদের পরিবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগামীতে আপনাদের সবার অংশগ্রহণ সমিতিতে অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা করি। আল্লাহ সবাইকে ভালো ও সুস্থ রাখুন।

আটলান্টিক মহাসাগরের কিনারায় একগুচ্ছ স্বপ্ন...

প্রকৌশলী মো. নুর আলম (সুমন)
প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও, ইউফাস্ট লি.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

দিনটি সম্ভবত ৪ অথবা ৫ আগস্ট, ২০১৭ ইং, নাগরিক ঐক্যের এক সমাবেশে, ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে একটা সভা করছিলাম আমাদের শিবগঞ্জ উপজেলার কৃতী সন্তান জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না ভাইয়ের সাথে। পিছন হতে একটা মাঝারি সাইজের ছেলে ডাক দিলো, সালাম দিয়ে বললেন, ভাই আপনার বাসা শিবগঞ্জ, দাড়িদহ তে না ? বললাম হাঁ, আপনি? উত্তরে বললেন, আমার নাম আব্দুল আলিম, আমার বাসা ও শিবগঞ্জে, কিচকে। ...গুড। তো এখানে কী করছেন? ভাই হাঁটাহাঁটি করছি। ওকে সভা শেষে একসাথে কথা হলো। দুইজনে কথা বললাম, বাংলাদেশের সব উপজেলার সমিতি, ঢাকায় আছে, কিন্তু আমাদের শিবগঞ্জের সমিতি নাই। জনাব মীর শাহ আলম ভাই, শিবগঞ্জের একটা সমিতি মানেজ করেন কিন্তু সেটার পরিসর খুবই সীমিত। দুইজন একমত হলাম সমিতি গঠনে একটা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

বাসায় আসলাম। বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম। ৬ অগাস্ট ২০১৭ ইং তারিখে সকালে অফিসে আসলাম। তখন আমি বাংলালায়নে চাকুরি করি। আমার ছোট ভাই রায়হানের সাথে কথা বললাম। রায়হান বলল, ভাই উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বড় ভাই মেজর (অব.) মাক্‌সুদুর রহমান আদনান ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। উনি ও বললেন শুরু করে দাও। যেমন কথা তেমনি কাজ, সাথে সাথে ফেসবুকের নতুন একটা গ্রুপ খুলে ফেললাম "ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলা সমিতি" নামে। সমিতির কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখে ফেললাম যাহ এখনো ফেসবুক পেজে বহাল রয়েছে। আপডেট আজও করা হয়নি। তারপর পরিচিত শিবগঞ্জবাসী, যারা ঢাকায় অবস্থান করছেন, তাদের আমন্ত্রণ পাঠালাম ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করার জন্য। প্রথম পোস্ট দিলাম্‌

"কুনটি বারে বগুড়া, শিবগঞ্জের লোকজন, আস না এখনে যোগ দিয়ে, সব্বাই সবাইকে চিনি ও জানি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই"

আমার কাছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের এই পোস্টটি একটি স্মরণীয় বিষয়।

তারপর আলিম, রায়হান, জাকারিয়া (মুক্তা), আদনান ভাইয়ের সাথে নিয়মিত কথা হয়, শিবগঞ্জ সমিতি নিয়ে, আলিম ও তার পরিচিত সবার সাথে কথা বলেন। একদিন আলিম মোবাইল কল দিয়ে বললেন, ভাই ঢাকায় বগুড়া সমিতির ইফতার পার্টি আছে, যাবেন নাকি, ওখানে গেলে শিবগঞ্জের কিছু পরিচিত মানুষজন পাওয়া যাবে। রাজি হয়ে গেলাম। দিন এবং তারিখ মনে করতে পারছি না। তবে বেইলী রোড, ঢাকায়। ওখানে বগুড়ার অনেক গুণী জ্ঞানী মানুষের সাথে পরিচয় হইলো। তারপর খোঁজখবর নেওয়া এখানে শিবগঞ্জের কে কে আছেন। পেয়ে গেলাম প্রকৌশলী মো. রফিক ভাই ও মো. এনামুল হক কান্দু ভাই কে। কথা হলো, পরিচয় হলো, শিবগঞ্জ সমিতি গঠন বিষয়ে সবাই একমত হলাম। তারপর এনামুল ভাই ও আলিমসহ ঢাকা, পিজি হাসপাতালে আমাদের অক্সফোর্ড স্কুলের চেয়ারম্যান জনাব সাখাওয়াত হোসেন টুটুল ভাইকে দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। টুটুল ভাই তার মামলা জনিত কারণে, পিজি হাসপাতালে মেডিক্যাল কাস্টডিতে ছিলেন। কিন্তু আমরা টুটুল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারলাম না। কারণ তখন অনেক রাত ৯টা বা ১০টা হবে এমন কারণে।

এরপর রফিক ভাই, আলিমসহ, ঢাকা গ্রীন রোডে, সেলনিবাস হোটেলের পাশে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে, সম্ভবত আমাদের এলাকার অথবা বগুড়ার কেউ ঐ হোটেল/ রেস্টুরেন্টে এর মালিক ছিলেন। আমরা প্রায় ৩-৪ দিন মিটিং করি। আমাদের সাথে বগুড়া জেলা সমিতির একজন সম্পাদক ১/২টা

মিটিং এ জয়েন করেছিলেন। রফিকভাই নিয়ে আসছিলেন। উনিও উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমরা আলোচনা করতেই থাকলাম কীভাবে আমাদের এই ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলা সমিতির যাত্রা শুরু করা যায়?

আমার ব্যক্তিগত একটা আইডিয়া ছিল এমন যে "কমিউনিটি বেজড সোশ্যাল বিজিনেজ"- যেখানে আমরা এমন একটা কমিউনিটি বা সংগঠন বা সমিতি গঠন করব যেখানে আমরা সবাই একসাথে কিছু প্রজেক্ট করার উদ্যোগ নিবো। সেটা হতে পারে জমি, বাড়ি নির্মাণ, সুপারশপ, স্বাস্থ্যক্লিনিক, গ্রামে কৃষিভিত্তিক (গরু, মুরগি, ছাগল) বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট, যেখানে আমাদের সমিতির সকল সদস্য, যারা মনে করবেন অর্থ বিনয়োগ করবেন এবং যারা বিনিয়োগ করবেন তাদের মাঝে হতেই সেই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, সেখানে সমিতির কাজ হলো উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং প্রসেস ডেভেলপ করে দেওয়া। যার বিনিময়ে সমিতি প্রজেক্টের লাভের একটা অংশগ্রহণ করিবেন। বাকি লভ্যাংশ বিনিয়গকারীদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করে দিবেন।

রফিকভাই আমার আইডিয়া শুনলেন, উৎসাহ দিলেন। তারপর রফিক ভাইয়ের একটা প্রজেক্ট বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বিষয়ে আইডিয়া ছিল এমন, যেখানে সিনিয়র সিটিজেনদের নিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড করবেন এবং উনি ইতিমধ্যে ওনার এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি জনাব ড. ইমদাদুল হক স্যারকে নিয়ে কিছু প্রোগ্রামও করেছিলেন, শিবগঞ্জ উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে।

আলিমের একটাই কথা, ভাই আমাদের সমিতি করতেই হবে যেভাবেই হউক।

এভাবেই আমাদের ৩-৪টা মিটিং চলতে থাকে। রফিক ভাই, ড. ইমদাদ স্যারের সাথে কথা বলবেন। একদিন আমি বললাম আমার একজন অনেক বড় ডাক্তার আছেন। উনি আমার সম্পর্কে কাকা হন। উনাকে আমাদের সাথে যুক্ত করলে সুবিধা হবে। তারপর আমি একদিন আমার পরিবারের চিকিৎসা নিতে গিয়ে ডাক্তার মোঃ মাইদুল ইসলাম, কাকার সাথে কথা বললাম, বিষয়টি নিয়ে। উনি বললেন ভালো উদ্যোগ। আমি বললাম কাকা আপনাকে থাকতে হবে। কাকা বললেন তোমরা করতে পারবে। আমি বললাম, কাকা, আপনি সামনে থাকলে ইনশাল্লাহ পারব।

তারপর রফিকভাইসহ আলিমকে বললাম কাকা রাজি এবং আমাদের দেখা করতে বলেছেন। ইতিমধ্যে রফিকভাই ড. ইমদাদ সারের সাথে কথা বলেছেন। তারপর একদিন রফিকভাই, ইমদাদ স্যার মিলে ড. মাইদুল ইসলাম, কাকার সাথে দেখা করলাম, মিটিং করলাম, ডক্টরস চেম্বারস, ধানমণ্ডি ৫-নাম্বার রোডে। আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হইলো জনাব ড. মাইদুল ইসলাম, কাকাকে আহ্বায়ক করে।

এভাবেই শুরু হলো একটা স্বপ্নের যাত্রা তারপর আসতে আসতে আমাদের সদস্য বাড়তে থাকল। আমাদের প্রথম ইফতার পার্টি ও আলোচনা সভা ৩০ নভেম্বর-২০১৮ ইং তারিখে।

তারপর অনেক সদস্যের সমাগম। সমিতির গঠনতন্ত্র গঠনসহ অনেক কর্মযোগ্য। এরপর পথচলা শুরু। সকলে মিলে একটা সামগ্রিক কল্যাণমুখী সমিতির যাত্রা শুরু হলো।

সেই সময়গুলোতে রফিকভাই, আলিম, ড. ইমদাদ স্যার, ড. মাইদুল ইসলাম, কাকা, তারপর মশিউর রহমান জুয়েল ভাই, হাসেমুজ্জামান ভাইসহ অনেকের সাথে একসাথে কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি, স্বপ্ন বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করেছি। এরপরের বছরে ২০২০ইং দেশের বাহিরে চাকরির সুবাদে সকলের সাথে আগের মতো হয়তো সময় আর দিতে পারি নাই। কিন্তু অ্যাটলান্টিক মহাসাগড়ের পাড়ে বসে, "শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা" এর জন্য যতটুক পেরেছি সহযোগিতা করেছি। স্বপ্ন দেখেছি যতবেশি সম্ভব। মনে সবসময় ধারণ করেছি যেখানেই থাকি না কেন দেখা হবে বিজয়ে।

আমি যেখানেই থাকি না কেন, "শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা" আমার জন্য একটা স্বপ্নের জায়গা, কোনভাবেই এই সমিতি বাধাগ্রস্ত হলে এই স্বপ্নের বীজ বোপন এবং রোপণের উদ্যোক্তা হিসেবে সবার সাথে আমারও কষ্টের সীমা হবে অপরিসীম।

সকলের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ভ্রাতৃত্ব সহযোগিতা উন্নয়ন

মো. আশরাফুল ইসলাম
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

Bond is stronger than blood
The family grows stronger by bond.

ঐতিহাসিক প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন এর রাজধানী পুণ্ড্রনগর জনপথ আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত পর্যটন এলাকা মহাস্থানগড় শিবগঞ্জ যা বর্তমানে **"সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী"** হিসাবে অভিহিত যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় শহিদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর হাত ধরে। উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলটি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে রয়েছে অতিথিপরায়ণতা, বন্ধুত্বপূর্ণ, বিনোদনপ্রিয়, ভ্রমণপিপাসু ও আড্ডাপ্রিয় বৈশিষ্ট্য যা আমাদের সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাপক সহায়তা করছে। আর এর মাধ্যমেই তৈরি করেছে ভ্রাতৃত্ববোধ সহযোগিতা ও আঞ্চলিক উন্নয়নের পথ। আরও তৈরি করেছে আঞ্চলিক মিলনমেলার মতো একটি অনুষ্ঠান। আমাদের মনে রাখতে হবে **"আঞ্চলিকতা মানেই সংকীর্ণতা ও আধুনিকতা নয়, আঞ্চলিকতার মাঝেই আছে নাড়ির টান ও আত্মপরিচয়"**।

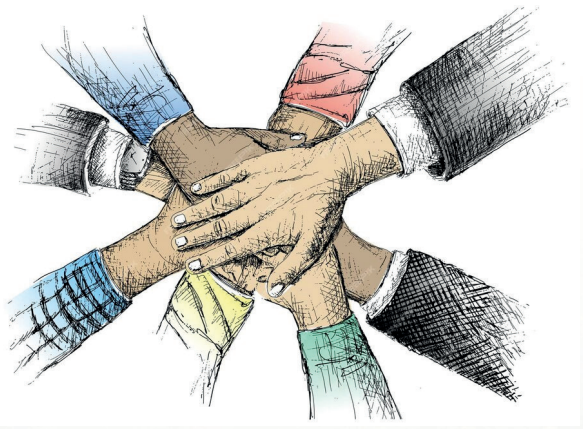

তবে, বর্তমান সমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ সময় একতাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করা খুবই দুরূহ। ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে যেটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তাহলো সদিচ্ছা। তবে আঞ্চলিকতাও ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আপনি যখন নিজ অঞ্চল থেকে দূরে কোথাও বসবাস করবেন তখন নিজ এলাকার কোনো ব্যক্তি সঙ্গে দেখা হলে বোঝা যায় ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতিটা কেমন? আমরা জানি, ভ্রাতৃত্ববোধ হতে সহোযোগিতার উদয় হয়। বিদেশে বা নিজ এলাকা হতে দূরে কোথাও যদি নিজ এলাকার ব্যক্তির সাথে দেখা হয় কিংবা বিপদে পড়ে তাহলে নিজ এলাকার ব্যক্তির সহযোগিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ঢাকা শহর আমাদের নিজ এলাকা (শিবগঞ্জ বগুড়া) থেকে বেশ দূরে যার কারণে এই এলাকা হতে ঢাকা শহরে এসে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই অঞ্চলিকতায় ভ্রাতৃত্বের জন্য তাদের সহোযোগিতা করা আমাদের একান্ত কাম্য। ধর্ম-বর্ণ ও দল-মতের ভেদাভেদ ভুলিয়ে সবার মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখা ভ্রাতৃত্ববোধের মহৎ উদ্দেশ্য। তাই আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধের চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। একজনের বিপদে অন্যকে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

রাসূল (সঃ) বলেন, **"সম্পীতি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে পুরো দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়"**। (বুখারি, হাদিস :৬০১১) সুতরাং সমাজ থেকে হিংসা, দাম্ভিকতা, অসহযোগিতা ও অশান্তি দূর করতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে ভ্রাতৃত্ববোধের চর্চা অপরিহার্য। একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভালোবাসার আশ্রয়স্থল পরিণত করতে হবে। তবেই ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠবে। আমরা আঞ্চলিকতার টানে ভ্রাতৃত্ববোধের চর্চায় একে অন্যের সহযোগিতার মাধ্যমে যতটুকু পারি নিজ অঞ্চল বা শিবগঞ্জের মাটি ও মানুষের উন্নয়নের জন্য একাগ্রহ চিত্তে কাজ করে যাবো। ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা সবাই একত্র হয়ে শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি, ঢাকা এর সকল সদস্যের সমন্বয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে শিবগঞ্জের উন্নয়নে কাজ করার চেষ্টা করব। শিবগঞ্জের প্রতিটি মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

সর্বোপরি, শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা এই সামাজিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে শিবগঞ্জ অঞ্চলের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্পীতি, সহযোগিতা ও শিবগঞ্জ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে শিবগঞ্জ উপজেলাকে আধুনিক কৃষিনির্ভর, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, উন্নত সংস্কৃতি, মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে শিবগঞ্জ উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসাবে নির্মাণ করার জন্য সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

প্রাচীন মহাভারতে পুণ্ড্রনগর খ্যাত শিবগঞ্জের আবছায়া ইতিহাস

সাজেদুর রহমান
গণমাধ্যমকর্মী
শিবগঞ্জ, বগুড়া

শিবগঞ্জ উপজেলা একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক উপজেলা। প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর, যা এই শিবগঞ্জ উপজেলাতেই অবস্থিত। ১৯৮৩ সালে এই উপজেলাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজশাহী বিভাগে, বগুড়া জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা।

১.
শিবগঞ্জ সভ্যতা বহুপ্রাচীন। লোককথা অনুসারে এখানেই ছিল কাঠের গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত শিবমন্দির। সেখানে ছিল ৬০ ফুট সাইজের বিশাল শিবমূর্তি। কিন্তু রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'পিতৃদয়িতা' গ্রন্থে যে অঞ্চলের কথা বলে, তার সঙ্গে শিবগঞ্জের সাদৃশ্য কষ্টকল্পনার। তাই প্রশ্ন জাগে, আদতেই এখানে এত বিশাল শিবমন্দির থাকা সম্ভব কিনা ? তবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, হিন্দু আমলে (১১৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) অসংখ্য শিবমন্দির গড়ে উঠেছিল এখানে। শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বন্দর-গঞ্জের নামানুসারে এখানকার নাম শিবগঞ্জ। যা নবাবী আমল বা মধ্যযুগ থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।

মধ্যযুগে দেব-দেবীর প্রভাবে এই অঞ্চলে অসংখ্য স্থাননামের উদ্ভব ঘটে। শিবগঞ্জের আশপাশের নামগুলোও হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে মাহাত্ম্যসূচক। যেমন বৃন্দাবন গোকুল (গোবর্ধনপুর), হরিপুর, মহিষাবান, কীচক, রামকান্দি, ভিমের জঙ্গাল, শ্যামপুর, রায়নগর, কৃষ্ণপুর, পরমানন্দপুর, কালীতলা, দাসপাড়া, নারায়ণপুর, ছোটনারায়ণপুর নাথপাড়া (সাবেক), সাহাপাড়া, দেবনাথপাড়া, কালীদহ সাগর, রথবাড়ি, দেবিপুর, রহবল, শীলা ও নেতারপাট, চাঁদমুহা প্রভৃতি।

২.
দেবতা শিব শিবগঞ্জের ইতিহাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। এই যে এখানকার প্রধান নদী করতোয়া; তার নামের সাথেও শিবের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। পৌরাণিক কিংবদন্তি আছে। কর অর্থ হাত, আর তোয়া অর্থ জল। হিন্দু দেবতা শিব হিমালয় পর্বতকন্যা পার্বতীকে বিয়ে করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে শিবের হাতে (কর) যে জল (তোয়া) ঢালা হয় সেই পানি নিঃসৃত হয়ে করতোয়া নদীর সৃষ্টি। করতোয়া নিয়ে সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি "করতোয়া-মাহাত্ম্য'। বারো শতকের এই পুঁথিতে করতোয়াকে মহানদী বলা হচ্ছে আর করতোয়া তীরবর্তী পুণ্য পৌণ্ড্রক্ষেত্র বা পুণ্ড্রনগর পৃথিবীর আদি ভবন (আদ্যম ভুবোভবনম) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আর কাশ্মীরের কবি কালহনের 'রাজতরঙ্গিনীতে' লিখেছেন, প্রাচীন নদী কলতু (আজকের করতোয়া)-
"পৌন্ড্র বর্ধনং ক্ষেত্রং নৈব মুনচতি কেশব
ধারিত্রা নাভি কমলাং প্লুতং করজৈলম
করতোয়া সদানীরে সবিৎ সুশ্রিতে
পৌন্ড্রান প্লায়েসে নিত্যং পাপং করোদ্ভাবে"
(অর্থ পুণ্ড্রবর্ধনের জলকাদায় আর'র লৌকিক উৎসব কিংবা ধর্মীয় বা প্রাত্যেহিক জীবনের জড়িয়ে আছে)

রাহুল সাংকৃত্যায়ন মতে বগুড়ার করতোয়া নদী কূলে অবস্থিত মহানগড়ে কোল-মুন্ডা জনগোষ্ঠীর নারী সমাজ খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতক থেকে পূর্ব ভারতে এক নতুন সভ্যতা প্রবর্তনে অবদান রাখে।

৩.
এই সভ্যতা তন্ত্রমন্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিল। আর তন্ত্রের কেন্দ্রে রয়েছেন অনার্য দেবতা শিব। যোগিনী-তন্ত্র-সহ প্রাচীন গ্রন্থে করতোয়াকে হীরক নদী বলে সম্বোধন করে বলছে, এই নদী তীরেই গড়ে ওঠা বিখ্যাত জনপদ প্রাচীন পৌন্ড্রবর্দ্ধন নগর।

এই নগরের গোকুল এলাকায় ডুমপুকুরের ধাপ ও কাঁঠালতলার ধাপ, রোজাকপুর (গোকুল থেকে পশ্চিমে), যোগীর ভিটা বা ধাপ, মহিষাবান, ছাইহাটা ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ কিছু নারী ছিলেন। যাঁরা যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন। দর্শন রচনা ও চর্চা করতেন তাঁরা, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী, তাঁদের আয়ত্তে ছিল তীর-ধনুক চালনা, জাদুবিদ্যা, শিক্ষকতা ও গুরুর দায়িত্ব পালন করা। ফলে আদিকালে নারীরা কেবল গুরুপত্নীই নন, সাক্ষাৎ গুরুও ছিলেন।

মহাস্থানে ডাকিনীর ধাপ বা ঢিবি নামে প্রত্ন স্থান আছে। এই ধাপে যে ডাকিনী থাকতেন তিনি বিক্রমশীলায় অধ্যাপনা করতেন এবং তাঁর উপাধি ছিল জ্ঞানডাকিনী। এই জ্ঞানডাকিনী অতীশ দীপঙ্করের গুরুর গুরু ছিলেন। তিনি পাঁচ-ছটি বই লিখেছিলেন। তাঁর রচিত বইগুলো হচ্ছে, উপায় মার্গচণ্ডালিকা ভাবনা, ক্রসম্বরমণ্ডলবিধি, প্রণিধান রাজ, মহামরজ্ঞান। জ্ঞানডাকিনীর ছিল হাজার হাজার অনুসারী।

তারনাথের ইতিহাস এবং সুমপোর পাগ-সাম-জোন-জঙ-গ্রন্থের সাক্ষ্যেও সুপ্রমাণিত নিগু-মা নামের এক মহিলা অধ্যাপিকার কথা। নিগু ডাকিনী চর্যাপদ রচনা করেছেন। তিব্বতী উৎস থেকে জানা যায়, নাঢ়া এবং নিগুমা ৭৬০ খ্রি.-এর দিকে গোপাল-ধর্মপালের রাজত্বকাল (৭৫০খ্রি. ৭৭০খ্রি. ৮০৬খ্রি.)-এ স্বকীয় সাধনসিদ্ধিতে দীপ্তিমান ছিলেন। তিনি সাঙ্গীতিক ভাব-ঐশ্বর্য ও মোহময় ছন্দ-শিল্পায়োজনে বরেন্দ্রী জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করে ছিলেন।

নাঢ়া পণ্ডিতের ইতিহাস প্রায় বিস্মৃত, হরপ্রসাদ না লিখলে আধুনিক বাঙালি জানতেও পারত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানান, বাঙালিদের মধ্যে গুরু হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে তুর্কি আক্রমণে এবং তাদের ধ্বংস লিলায় সমস্ত লাইব্রেরি ধ্বংস হয়। সেই সাথে আমাদের গৌরব হারীয়ে যায়।

৪.
চলতি বাংলায় ডাইনি বা ডাকিনী বলতেই যে ছবিটি ভাসে, তাতে কোনো লোলচর্ম বুড়ি, ভীষণদর্শনা, মন্ত্রসিদ্ধা নারীকে দেখি। কিন্তু ডাইনি আদিতে ছিল সম্মানজনক উপাধি। তিব্বতী অর্থ জ্ঞানী- স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। ডাইনি বা ডাকিনীর অর্থ বদলেছে। কি আশ্চর্য না?

এখানে প্রসিদ্ধ নিগু-মা, নাঢ়া ছাড়াও ডাইনিদের যে চিত্তাকর্ষক তালিকা পাই তা আমাদের একেবারেই অপরিচিত নয়। গয়, বিমল, শ্রীশ, শ্রীধর, মঙ্গলায়ন, মঙ্গল, রঙ্গবল্লীশ, রঙ্গোজী ও দেবনায়ক, ইহার গোকুলে নবনন্দ নামে কথিত। লহনাসহ ১০টি ঢিবি তান্ত্রিক/যোগিনীর আশ্রম বলে পরিচিত। এসব ঢিবির কয়েক মাইলের মধ্যা গোকুল ও হরিপুর গ্রামে ডাকিনীদের (খোঁজার ঢিবি) রোজাকপুর অবস্থিত।

মৌখিক ইতিহাস থেকে জানি, শাহ সুলতান (বখলী) মাহীসওয়ারের সাথে রাজা পরশুরামের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শীলাদেবী তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু পীর বখলীর কৌসল্যার কাছে শীলাদেবীর তন্ত্র পরাজিত হয়। রাজা পরশুরাম যুদ্ধে পরাজিত হলে শীলাদেবী তখন করতোয়ায় আত্মবিসজর্জন দেন। যে স্থানে শীলাদেবী আত্মহুতি দিয়েছিলেন সেখানে পৌষসংক্রান্তি ও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে স্নান হয়।

৫.
এবার একটা গল্প বলি। গল্পটা পাঁচ হাজার বছর আগের।

শিবগঞ্জের প্রসিদ্ধ স্থান কীচক। আজ থেকে এক-দেড়শ' বছর আগেও এখানে ছিল বিশাল নৌবন্দর। এই বন্দরের নাম 'কীচক' হলো কিভাবে তার কাহিনী বলছি।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লখিত 'কীচক' পুণ্ড্র তথা মহাস্তনা থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরপূর্বে কীচক ইউনিয়ন। এখান থেকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় যাওয়া যায়। এই গোবিন্দগঞ্জে আজ থেকে খ্রি.পূ. নবম থেকে অষ্টম শতকে গভীর অরণ্যের মাঝে কীচকের দুলাভাই-এর মৎস্যদেশের রাজধানী ছিল। রাজা বিরাটের অগাধ ধনসম্পদ ছিল। সম্পদের মধ্যে ৬০ হাজার গাভীর বিশাল খামার ছিল। বিশাল এই গোসম্পদ রক্ষায় বড় হুমকি ছিল দস্যুদের হামালা। ডাকাত দল যখনতখন গোধন লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। রাজা জানতে পারলেন সুশরমার রাজা ত্রিগর্তরাজ ঝামেলাটা করছে। তিনি শ্যালক কীচককে সাথে নিয়ে ত্রিগর্তরাজকে আক্রমণ করলেন। কীচকের দুঃসাহসিকতায় সহজেই পরাজিত করেন। ত্রিগর্তরাজা পালিয়ে দুর্যোধনের কাছে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রাজা বিরাট কীচককে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। কীচকের দস্যুদমনের সেই শৌর্য শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় রাজা ইদানীং কীচকের কোনো ব্যাপারে কিছু বলে না। এদিকে পঞ্চপাণ্ডব ১২ বছরের বনবাস যাপন এবং এক বছর অজ্ঞাত বাসের সময়কালে বিরাট রাজার দরবারে নিল। এক্ষেত্রে পাঁচ সহোদর নিজেদের নাম পরিচয় গোপন করেছিলেন। যুধিষ্ঠি কঙ্ক নামে সভাসদ, ভীম বল্লভ নামে পাচক, অর্জুন বৃহন্নলা নামে রাজ কন্যা উত্তরার সঙ্গীতশিক্ষক, নকুল তন্তিপাল নামে গোশালার অধ্যক্ষ আর সহদেব গ্রন্থিক নামে অশ্বশালার অধ্যক্ষের কাজ নিলেন।

পাণ্ডবরা সবাই নিজ নিজ কাজে ভালো করছিলেন। রাজা তাই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এ পর্যন্ত ঠিকঠাক চলছিল, গোল বাঁধল যখন দ্রৌপদীও কাজের খোঁজে এই দেশি এসে হাজির হলেন। গৌর গায়ের রং। দেখতে সুন্দর। কথা বলে ভদ্র ভাষায়। সমস্যা হলো কেউই তাকে কাজ দিতে চাচ্ছিল না। সবার এক কথা, না বাপু তোমাকে দেখে কাজের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। রানী সুদেষ্ণা তখন প্রাসাদের ছাদে রোদ পোহাচ্ছিলেন। তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। মেয়েটাকে ডেকে পাঠালেন।

কাজ খুঁজতে আশা মেয়েটা বলল, 'আমার স্বামী পাঁচজন গন্ধর্ব। কোনো কারণে তাদের এখন চরম সঙ্কটে পড়েছে। আর আমি সৈরিন্ধীর কাজ করে দিন কাটাচ্ছি। এর আগে আমি সত্যভামা আর দ্রৌপদীর ঘরে করেছি। এখন আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আশ্রয় দিলে খুব উপকার হয়। সুদেষ্ণা আশ্রয় দিলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধীর কাজ দিলেন। দ্রৌপদী রানীর সেবা করে ভালোই চলছিল। রানীও তাকে অত্যাধিক মায়া করত।

এর মধ্যে একদিন রানী সুদেষ্ণার কাছে তার ভাই কীচক দেখা করতে এলো। আর তখন রানী ভাইকে খাবার দেওয়ার জন্য সৈরিন্ধ্রীকে আদেশ করে। কীচক রূপবতী সৈরিন্ধ্রীকে দেখেই পছন্দ করে ফেলে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না সৈরিন্ধ্রী দৃষ্টির আড়াল হয়। ভাইয়ের এই দৃষ্টি বোনের নজর এড়ায় না।

কীচক কোনোপ্রকার রাখঢাক না করেই সৈরিন্ধ্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীকে রূপী দ্রৌপদী বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। প্রেমে বাধা পেলে দ্বিগুণ হয়। কীচকের ক্ষেত্রে তা হলো চার গুণ।

ভাইয়ের বারবার অনুরোধে বোন সুদেষ্ণা উপাই বের করলেন। এক রাত্রি স্নেহের ভাইয়ের জন্য রানী অন্তপুরিতে রাতের খাবারের বিশেষ কয়েকটা পদ রান্না করার হুকুম দিলেন। রান্না হলে সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে ডেকে বলল, পুঁই পাতায় কইমাছের ডিমের ভুনা, শিং মাছের ডিমের পাতুরি, বেসনে ডুবিয়ে বকফুল ভাজি আর ঝিঙ্গা দিয়ে রাঁধা লাবড়া। কীচকের প্রিয় খাবার। তরকারি গুল বাটিতে নাও আর সবুজ কলাপাতায় ধবধবে সাদা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত সাজিয়ে ঘরে গিয়ে দিয়ে এসো।

খাবার দিতে যাওয়াটা দ্রৌপদীর জন্য যথেষ্ট বিব্রতকর। কীচক তাকে সামনে পেলেই গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু রানীর আদেশ ফেলতে পারল না। সে কীচকের ঘরে প্রবেশ করল এমনভাবে যাতে কোনমতে রেখেই চলে আসতে পারে। যাতে কীচক কিছু করার সুযোগ না পায়।

নিভৃতে সৈরিন্ধ্রীকে পাওয়ার এই সুযোগ তো কীচকেরই বুদ্ধিতে, সেটা দ্রৌপদী বুঝতে পারেনি। সে ঘরে ঢুকতেই কীচক দ্রৌপদী ধরে ফেলল। দ্রৌপদী মিনতি করে বলল, আমার সাথে এমন করবেন না। আমার পক্ষে আপনাকে গ্রহণ করা সম্ভব না।

কথাটা শুনে কীচকের যেন ক্রোধ বেড়ে গেলো। সে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে ছুড়ে মারল। দ্রৌপদী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আমার গর্দ্ধব স্বামীরা যদিও দুঃখে পড়েছে, তবুও তারা আমাকে সবসময় সর্বদা রক্ষা করেন। কেউ আমার অপমান করলে, তারা তাকে মেরে ফেলেন। এই কথা শুনে কীচক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে সৈরিন্ধ্রীকে ছেড়ে দুহাত প্রসারিত করে বলল, ডাক তোর স্বামীদের, আমার কিছুই করতে পারবে না।

এই সুযোগে দ্রৌপদী কীচককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেক বেরিয়ে দৌড়ে রাজার কাছে বিচার দিলো। মুহূর্ত খানেক পরে সেখানে কীচকও রাজ দরবারে ঢুকে পড়ল। দরবারে তখন যুধিষ্ঠি আর ভীম উপস্থিত ছিল। কীচক রাজাকে তোয়াক্কা না করে সেখানেই দ্রৌপদীকে উন্মাদের মতো শারীরিক লাঞ্ছিত করতে লাগল।

কীচকের এই অন্যায় দেখেও রাজ বিরাট কিছু বললেন না। চোখের সামনে দ্রৌপদীর এমন নির্যাতন ভীমের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। যুধিষ্ঠি লক্ষ্য করল ভীম রাগে কাঁপছে আর একটু পরপরই একটা গাছের দিকে তাকাচ্ছে। ভীম কি ওই গাছ উপড়ে তুলে সভার সবাইকে পিটিয়ে তখতা বানানোর কথা ভাবছে? যুধিষ্ঠি ভাবল এটা হলে মহাসমস্যা হবে।

ভীমকে থামাতে হবে। সে বলল, কী হে পাচক ঠাকুর, কাঠের জন্য গাছের দিকে তাকাচ্ছ? কাঠের গাছ বাইরে গিয়া খোঁজ। এই কথা বলার ফাঁকে ভীমকে ইঙ্গিতে শান্ত থাকীতে বলল।

এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। পাণ্ডবেরা সিদ্ধান্ত নিল কীচককে শেষ করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন দ্রৌপদী ঠোটে বাঁকা হাসি দিয়ে কীচককে রাতে তার ঘরে আসার ইঙ্গিত করল। বেপরোয়া কীচক সন্ধ্যা না পেরোতেই দ্রৌপদীর ঘরে ঢুকে পড়ল।

পাণ্ডবরা ভেবেছিল রাতে আসবে। তখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে। সেই সুযোগে কাজ সারবে। কিন্তু কীচক ঢুকল যখন প্রাসাদে তখন সবাই জেগে আছে। কী আর করা। ভীম যখন হত্যালীলা চালাছিল তখন কীচকের আর্ত চিৎকার ঢেকে দিতে মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল।

মহাভারতের সূত্রে জানতে পারি, ভীম এতটাই রেগে ছিল যে, কীচকের হাড্ডি-গুড্ডি ভেঙে ভর্তা বানিয়েছিল। কীচকের বেস কয়েকজন ভাই ছিল ভীম তাদেরও হত্যা করে।

কাহিনিটা মহাভারতের বীরটা রাজা পর্বের। মহাঋষি বেদব্যাস রচয়িতা। আর কাসিনাথ বাংলায় মহাভারতে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। মহাভারতে বলা হচ্ছে, কীচক পুণ্ড্র নগরীতে বাস করতেন। তার নামানুসারে করতোয়ার তীরে নৌবন্দরটির নামকরণ হয়।

কমলা সুন্দরী ও প্রাচীনযুগীয় কবিদের জন্মভূমি শিবগঞ্জ

আরিফ আনজুম
লেখক ও শিক্ষক
আল ফুরকান ইসলামী একাডেমী, শিবগঞ্জ, বগুড়া

শিবগঞ্জ উপজেলার প্রাচীনকালে কবি সাহিত্যিকদের রচনাবলির দ্বারা যেমন আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বার বার ফিরে পাই। তেমনি আধুনিককালে কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলি দেশের তথা সাহিত্যের বিশ্ব-ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অতীত ও বর্তমানে এ মহামিলনের মধ্যে সেতু রচনা করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের সকল ইতিহাস একদিন বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমর্জ্জিত হবে। ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন এ কথা শুধু মুখে বললেই হবে না, সঠিক ইতিহাস রচনার মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিকৃত ইতিহাসের মধ্যে নয়। সঠিক ইতিহাসই জীবিত রাখে তার পুরনো স্মৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যকে।

১১৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উপজেলায় দুইজন কবির সাক্ষাৎ পাই। গৌড়ের রাজা মদন পাল দেবের সময়ে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জন্মস্থান হিসেবে উল্লেখ পাওয়া গেছে মহাস্থানের সন্নিকটবর্তী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর। তাঁর পিতা কায়স্তদের অগ্রণী ছিলেন। পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী বলে উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার। পিতামহের নাম পিনাক নন্দী। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যগ্রন্থের নাম 'রামচরিতম'। রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার কাহিনি গ্রন্থটির মূল উপজীব্য বিষয়। ঐতিহাসিকগণ তাঁর কাব্যের ভাষাকে মার্জিত ও সুরুচিকর বলে অভিহিত করেছেন। অপর কবি হলেন অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, তাঁর জন্মস্থান শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার গ্রামে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'হারলতা'। রমেশ চন্দ্র মজুমদার 'পিতৃদয়িতা' নামে আরেক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য রাজা বল্লাল সেনের সাহিত্যগুরু ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন।

শুধু সাহিত্যই নয়, আমাদের শিবগঞ্জ উপজেলা প্রাচীনত্বের সাংস্কৃতিতেও ছিল সর্বোত্তম সাংস্কৃতির উদাহরণ। যার প্রমাণস্বরূপ পেয়েছি,

ভালো করিয়া বাজাও গো
দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে,
সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর
রিনিঝিনি করিয়া বাজে রে...

নাচতে জানুক বা না জানুক উপরের গানের কলি কয়টি জানে না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাংলার নাচের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এ গানটি প্রাচীন কোনো অজানা স্বভাবকবি রচনা করেছিলেন যা লোকমুখে আজও কমলার নৃত্যের কথা বলে। কখনো কি ভেবেছেন কে এই কমলা? আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি যে কমলা এ বাংলার একজন নারী, বস্তুত পুণ্ড্র-তনয়া (শিবগঞ্জের মেয়ে)। একজন দেবদাসী হয়েও যিনি ইতিহাসের পাতায় আজও একটি উজ্জ্বল নাম। এই কমলা সুন্দরীর বাসস্থান আমাদের শিবগঞ্জ উপজেলায়।

প্রফুল্ল চাকী নামে এক আত্মঘাতী যুবকেরও জন্ম ছিল এই শিবগঞ্জ, আমরা আমাদের নিজেদের জন্মগ্রহণকারীদের নামে কোনো স্থাপত্যকলা নামফলক না করে করছি অন্যত্রের সব তরুণ আত্মঘাতীদের নামফলক। বড় দুঃখের বিষয় আজ অব্দি শিবগঞ্জ কোনো এক স্থানে এই কীর্তিমান সন্তানদের নামে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি। এমনকি একটা রাস্তার নাম পর্যন্তও না। তবে হয়েছে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নামে নানা প্রতিষ্ঠান ও নানা রাস্তার ও স্থাপত্যকলার নাম। আমি আমার এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ কল্যাণ সমিতির নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, অন্ততঃপক্ষে সন্ধ্যাকর নন্দী, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য ও ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বীরপুরুষেত্বের অধিকারী প্রফুল্ল চাকীর নামে কিছু একটা স্থাপনায় উজ্জীবিত করে রাখি। আমরা চাইলেই মোকামতলা জয়পুরহাট রোডের যে মোড় রয়েছে সেখানে প্রফুল্ল চাকীর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করে মোড়ের নামকরণ করতে পারি "প্রফুল্ল চাকী চত্বর/মোড়"। মহাস্থান মাযার গেটের সামনে যেখানে শিবগঞ্জ রাস্তার ত্রিমোহনী আছে সেখানটির নামকরণ করতে পারি "সন্ধ্যাকর নন্দী চত্বর/মোড়" আর নাগরবন্দর তুলো অফিসসংলগ্ন একটি চত্বর তৈরি করে যানজট নিরসন ও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে করতে পারি "অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য চত্বর/মোড়"। পর্যায়ক্রমে আমাদের শিবগঞ্জ এর উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এবং শিবগঞ্জকে

উজ্জীবিত করে আজীবন স্মরণীয় করে রাখতে আরো অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে আমাদের শিবগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর নিকট খুব সহজে তুলে ধরা সম্ভব হবে। কারণ আমাদের শিবগঞ্জ একটি পর্যটনকেন্দ্র।

'ইতিকথা শিবগঞ্জ' বইয়ের তথ্য খুঁজতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্যের উন্মেষ ঘটে সামনাসামনি। উপজেলার কিচক ইউনিয়নের শালদহ জাঙ্গালপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে রয়েছে অনেক অজানা ইতিহাস। যার হদিস এখনো আমি নিজেও মিলাতে পারিনি পরিপূর্ণভাবে। পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ ভীমের জাঙ্গালের প্রবর্তক তথা ভীম রাজা ও পশুরামের রক্তের ঘনিষ্ঠজন পদ্মবর্তীর এক অলৌকিক ইতিহাস লুক্কায়িত রয়েছে। যার ইতিহাস সংগ্রহে গিয়ে অনেকটা চোখ কপালে ওঠার মতো ইতিহাসের নির্দেশনা পেয়েছি। এই জাঙ্গালপাড়া স্থানটি তৎকালীন ভীম রাজার সৈন্য সামন্তদের বাসস্থান। এখানে ভীমের রাজাগণ চুলায় রান্না করত তার নমুনাস্বরূপ এখনো অনেক প্রমাণ দৃশ্যমান রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, ভীম রাজার সৈন্যরা যে চুলায় রান্না করতো তার আয়তন ছিল ৩৩ শতাংশ ভূমির সমতুল্য আয়তনের একটি চুলা। এতদঃ এই চুলার তিনটি (ঝিক) প্রধান সহায়ক ছিল, যার প্রতিটির আয়তন ছিল ৮ শতাংশ ভূমি। প্রমাণস্বরূপ একটি ঝিককের সন্ধান। যা জাঙ্গালপাড়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। একটি ঝিকের উপরে একটি মসজিদ স্থাপন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সাঁওতালপল্লীর দিকে এগোতেই চোখে পড়ে আরেক ঐতিহ্যের অকথ্য ও অজানা গম্ভীর ইতিহাস। অর্থাৎ পদ্ম পুকুরের ঐতিহ্য আশ্রিত চোখ ধাঁধানো ইতিহাস। পদ্মপুকুরের নামকরণের ইতিহাস জানতে সাঁওতালপল্লীর এক নব্বইউর্ধ্ব বৃদ্ধকে পদ্মপুকুরে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই সে জানায়, আমার দাদুর মুখে শুনেছি, পুণ্ড্রনগর থেকে পদ্মরাণী মাঝে মাঝে এখানে ভীম রাজার সাথে দেখা করতে আসতো এবং দেখা শেষে এই পুকুরে পদ্মরাণী গোসল করতেন আর সেই ফলশ্রুতিতে এ পুকুরটির নাম পদ্মপুকুর করা হয়েছে। এখনো এই স্থানে অনেক স্মৃতি ও নানারকম প্রবাদ প্রবচন বিদ্যমান তৎকালীন সময়ের পদ্ম ও ভীমের পারিপার্শ্বিক বিষয়াদির। যা আজো কালের সাক্ষীস্বরূপ আমাদের মাঝে নোংরা আর দখলবাজদের দখলত্বে বিলীন সংস্কৃতি হিসেবে আংশিক উজ্জীবিত রয়েছে। আসলে ইতিহাস বলে কিংবা লিখে শেষ করার মতো নয়, আর সেখানে বাংলার জন্মের পূর্বের ইতিহাস আমাদের শিবগঞ্জের ইতিহাস, তাই আজ "ইতিকথা শিবগঞ্জ" বইয়ের আংশিক এই লেখাটুকুর মাধ্যমেই এখানেই সমাপ্ত করছি হাতে ধরা কালো কলমটির কালি।

মহাস্থানগড়ের কথা

প্রকৌঃ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

মহাস্থান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিখ্যাত স্থান। কেউ কেউ মনে করেন যে স্থানটির আসল নাম মহাস্নান বা বিখ্যাত স্নানের জায়গা আবার স্থানীয় মুসলমানদের মতে স্থানটির নাম মহাস্থানগড় যা একটি স্থানীয় কিংবদন্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বগুড়া শহরের উত্তরে ১৮ কি. মি. দূরে বগুড়া রংপুর মহাসড়কের পাশে শিবগঞ্জ উপজেলার রায়নগর ইউনিয়নে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে এদেশের সর্বপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য হতে জানা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী হতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্য মহাস্থানগড় একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদরূপে গড়ে ওঠে। এভাবে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই গড় মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, মুসলিম এবং আরও হিন্দু সামন্ত রাজাদের রাজধানী ছিল।

প্রাচীর ঘেরা এই নগরীর দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফুট এবং প্রস্থ ৪৪০০ ফুট। চারপাশের ভূমির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। প্রাচীন এই নগরীতে প্রায় আট কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শহরতলী। নগরকেন্দ্রের বাইরেও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসা কেন্দ্র। এখানকার মাটিচাপা পড়া বসতিস্তরগুলোতে আড়াই হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে নানা আমলের সোনা তামা, লোহা ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু এবং পাথর ও পোড়ামাটির দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেছে। এসব দ্রব্যের মধ্যে আছে বুদ্ধমূর্তি দেব-দেবীর এবং নানা প্রাণীর মূর্তি, অলংকার, মাটির পাত্র, পোড়ামাটি ও পাথরে খোদিত চিত্রকলা, লোহা বর্শা, তামার পদক, খেলনা, সিল, বর্শা, ক্ষুর, চাকু ইত্যাদি। সে যুগে এখানে পুরাকৌশল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যা বা আর্কিটেকচার অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। পাচিলসহ পাকা ইমারত, ইটের সিঁড়ি, বারান্দাসহ বহুতল অট্টালিকা, ইট-পাথর বাঁধানো রাস্তা, কুয়ো, পানি নিষ্কাশনের নালা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের মাধ্যমে এখানকার সভ্যতা যে কতখানি উন্নত ছিল তা বুঝতে পারা যায়। মহাস্থানগড়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাস্থানগড়, মঙ্গলকোট, গোকুলমেধ, স্কান্ধধাপ, ভাসুবিহার, শবদল দীঘি, গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা। এছাড়াও রয়েছে মানকালির কুন্ডু, পরশুরামের প্রাসাদ ঢিবি, জিয়ত কুন্ডু, কূপ, খোদার পাথর ভিটা নামের ঢিবি, তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ, মুনির ঘোন, নরসিংহের ধাপ ইত্যাদি।

১৮৮০ সালে বুকানন হ্যামিলটন নামে একজন ইউরোপীয় মহাস্থানগড় এবং এর সংলগ্ন অঞ্চল ঘুরে ফিরে দেখেন। এরপর পরবর্তী আশি বছর ধরে মোট ৩ পর্বে মহাস্থানগড়ে খনন কাজ পরিচালিত হয়েছে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তৃতীয় পর্বে বাংলা-ফরাসি যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৩ হতে এ পর্যন্ত বৈরাগীর ভিটা, পূর্ব বাহুর মাঝামাঝি অংশ এবং মাজার এলাকায় খনন অব্যাহত রয়েছে। এসব খননের মাধ্যমে উন্মোচিত হচ্ছে ইতিহাসের নানা চমকপ্রদ দিক।

মহাস্থানের এসব তাৎপর্যপূর্ণ সাইটসমূহের সমন্বিত জ্ঞানলাভের জন্য অবশ্যই আসতে হবে মহাস্থানগড় জাদুঘরে। এখানে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের বিপুল সংগ্রহ। মহাস্থান জাদুঘরের ভ্রমণ মানেই অভিজ্ঞতার ঝুলিতে বিশাল এক সঞ্চয়। অবশেষে সমগ্র বগুড়া জেলাজুড়েই এত প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যে তা গুণে শেষ করা যায় না। এখানে এলেই জানতে পারা যায় বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কত-সমৃদ্ধ। আর দেশকে না জানলে দেশের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে কেমন করে?

নদী বাঁচলে, বাংলাদেশ বাঁচবে

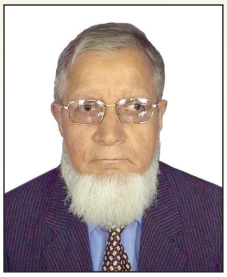

অধ্যাপক ডা. এ জেড এম মাইদুল ইসলাম
সাবেক চেয়ারম্যান (চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ) বিএসএমএমইউ
ও
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, শিবগঞ্জ উপজেলা(বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

বিশ্ব মানচিত্রে ছোট অথচ ঘনবসতিপূর্ণ বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নদী বিধৌত পল্লিমাটির দেশ।পৃথিবীর উর্বরতম সুজলা-সুফলা দেশ বাংলাদেশ। পাহাড় থেকে সমতল পর্য্যন্ত সব জায়গায় আবাদ হয়, যা ফলাবেন তাই হয়। অতুলনীয় এই দেশের সোনার মাটি, যেন সোনার খাঁটি বাংলার মাটি। এখানে অনেক নদ-নদী ও শত শত খাল-বিল রয়েছে। কয়েক যুগ আগেও বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিলগুলো পানিতে ভরপুর ও প্রবহমান ছিল। কী সুন্দর ছিল তাদের রূপ ও স্রোতধারা! বাঙালির জীবন কেটেছে নদীর পানিতে স্নান করে সাঁতার কেটে। মানুষের সমাজ জীবন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনীতিতে নদী প্রধান ভূমিকা পালন করছে। নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে শহর ও বন্দর। প্রবাদ আছে বাঙালির জীবন মাছে ভাতে। মাছ ও ভাত উভয়ই আসে নদী থেকে। জমিতে ধান, গাছে ফল ও নদীতে মাছ এ যেন রূপকথার দেশ বাংলাদেশ। আজকের এই বাংলাদেশে সেই আদি রূপ আর নেই। অতীতে যতসব নদ-নদী, খাল-বিল তাদের অনেকগুলো এখন মৃতপ্রায়। এসব যত না প্রাকৃতিক কারণে, মানুষের কারণেই বেশি। বাংলাদেশ সরকারের হিসেবমতে ছোট-বড় মিলে ১১৫৬টি নদী আছে, যার কতগুলো সীমান্ত বা আন্তর্জাতিক নদী ও আভ্যন্তরীণ নদী। যেসব নদী এক দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্য দেশের ভেতর দিয়ে সাগরে পড়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক নদী। বাংলাদেশে যেসব নদ-উপনদী প্রবাহিত হয় তাদের উৎপত্তি হিমালয় ও লুসাই পাহাড়ের হিমবাহ গলিত পাহাড়ের ঝর্ণা ও জলাভূমির বিল থেকে। যমুনা, পদ্মা ও মেঘনা বাংলাদেশের প্রধান নদী হলেও আরো অনেক শাখা ও উপনদী আছে। তার মধ্যে তিস্তা, মহানন্দা, গোমতী, দুধকুমার, ধরলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে অল্প বৃষ্টিপাত হয়। তাই শরতে খাল-বিল ও নদীগুলো শুকাতে থাকে। আবার বর্ষায় পানিতে ভরে ওঠে। নদী ও জলাভূমি ছিল সকলের যেখানে জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা মাছ ধরে জীবনযাপন করত আর প্রান্তিক সাধারণ জনগণ মাছ ধরে খেয়ে আমিষের চাহিদা মেটাত। দেশের বড় বড় বিল, নদী ও মোহনা ছিল মাছের বিচরণক্ষেত্র। বর্ষায় বন্যা ছিল সাংবাৎসরিক স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই মানুষ বাড়িঘর নির্মাণ করত উঁচু জায়গায় তেমনভাবে যেন স্বাভাবিক বন্যায় ঘরে পানি ঢুকতে না পারে। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি যেমন হয় তার উপকারিতাও অনেক বেশি।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। পানিবাহিত আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে নেপালের কাঠমান্ডুতে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে গিয়েছিলাম। নিরাপদ সুপেয় পানি নিয়ে আলোচনা চলছিল। এ সময় নেপালের এক প্রবীণ ডাক্তার সাহেব যিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ঢাকায় দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। তিনি বললেন যে, "নেপালে অনেক নদী তথা পানির উৎস অথচ তাদের দেশে পানির অনেক সংকট। কারণ পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় তাদের দেশে সব জায়গায় পানি থাকে না।" বাংলাদেশ সমতল বলে অনেক নদী ও খালবিল আছে। তাই পানির সংকট নেই। যদিও বন্যা মাঝেমধ্যে বাংলাদেশে কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে। পরক্ষণেই সে ডাক্তার সাহেব আরেকটি মন্তব্য করলেন যা আজও আমার মনে আছে। সেটি হলো, "বাংলাদেশের মানুষ বন্যা উহলড়ু (উপভোগ) করে, অর্থাৎ আনন্দ উৎসব করে যতক্ষণ না পর্যন্ত বন্যার পানি তার ঘরে প্রবেশ করে।" কথাটি সত্য। ছোট বেলায় দেখেছি যখন বন্যায় নদী ও তার আশেপাশের অঞ্চল প্লাবিত হয় তখন কিশোর-কিশোরীরা, সাধারণ জনগণ মাছ ধরা, নৌকাবাইচ ও নৌকা ভ্রমণসহ নানারকম আনন্দ উৎসব করত। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ব্যাপক বন-জঙ্গল, গাছপালা নিধনের ফলস্বরূপ মৌসুমি বৃষ্টিপাত ও বন্যা তেমন একটা হয় না। তবে বিগত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে অতি অল্প সময়ে পচুর বৃষ্টিপাত দরুণ অকস্মাৎ ভয়াবহ বন্যার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যাকে অনেকেই বৈশ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তন (Global Climate Change) প্রতিক্রিয়া ও Flash flood বলেও অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশে কয়েকমাস আগেও (আগস্ট, ২০২৪) স্মরণকালের যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল তা কি শুধু বৈশ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ? অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। সেগুলো আমরা বিচার বিবেচনা নিয়ে সরকারি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি বলে আমার জানা নেই। অদূর ভবিষ্যতে আবারও দেশ যে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? বাংলাদেশে নদী-খাল-বিল শুকিয়ে মৃতপ্রায় হওয়া, অকস্মাৎ ভয়াবহ বন্যায় জীবন ও সম্পদের ক্ষতি এবং নদী ভাঙনের ফলে অনেক মানুষ সম্পদহীন, গৃহহীণ ও নিঃস্ব হয়ে উদ্বাস্তুর মতো দেশের বিভিন্ন শহরে বসবাস করছে। ফলস্বরূপ পরিবেশ দূষণ, সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক চাপ দিন দিন বেড়েই চলছে।

নদী, খাল-বিল মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত যা কখনো দুঃখ-দুর্দশার কারণ হতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আল্লাহ যিনি উপকারার্থে নিয়োজিত করেছে নদ-নদীকে।" (সূরাঃ ইব্রাহিম, আয়াত-৩২ শেষাংশ)

আল কোরআনের অনেক সূরায় আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ বেহেশতের বর্ণনা দিয়েছেন তার তলদেশ দিয়ে প্রবহমান ঝর্ণার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, প্রবহমান জলধারা অর্থাৎ সমুদ্র, নদী-নালা সুখময় জীবন ও শান্তির জন্য এক অতুলনীয় নিয়ামত।

বিশ্বের অনেক দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে খাল-হ্রদ ও বিভিন্ন ধরনের জলাধারা তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহ প্রদত্ত নদ-নদী, খাল-বিলকে নানাভাবে দূষিত করছি ও নদীর প্রবাহ বন্ধ করছি। আমাদের নদী ও খাল-বিলগুলো দুর্দশার কারণ প্রসঙ্গত উল্লেখ না করলেই নয়-

১. মৌসুমি বৃষ্টিপাত কম হওয়া।

২. উজানে অবস্থিত ভারত কর্তৃক আন্তর্জাতিক নদীগুলোর উপর অনেকগুলো ব্যারেজ ও বাঁধ নির্মাণ করে পানির প্রবাহ তার নিজ দেশে নিয়ে নেয়া। ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো প্রবাহ হারিয়ে পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য, নৌপথ অচল, খরা-বন্যায় কৃষিপণ্য বিপর্যয়সহ নানাবিধ অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৩. বাংলাদেশের নদী ও জলাভূমিসমূহ ইজারা প্রদান, ইজারাপ্রাপ্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ বিল, জলাশয়গুলোকে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন করছে। অতিমাত্রায় পানি নিষ্কাশন করে মাছসহ সকল প্রকার জলজ প্রাণীর একদিকে বিলুপ্তি ঘটছে। অপরদিকে জায়গাগুলো ফসলি জমি হিসেবে চাষাবাদ করছে। ফলে জলাশয় আর থাকছে না।

৪. নদীপারের খাসজমি ও নদী ভরাট করে বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ ও অপরিকল্পিতভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন করা।

৫. নদী খাল ও জলাভূমিতে শিল্পবর্জ্য, পলিথিনসহ অন্যান্য কঠিন বর্জ্য ফেলে নদীকে চরমভাবে দূষিত ও ভরাট করছে। ফলস্বরূপ নদীর পানি যেমন ব্যবহার অযোগ্য ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি নদীর মাছ ও নদীপথের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে।

উপরোক্ত কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে ভারত কর্তৃক নির্মিত ব্যারাজ ও ড্যামের প্রভাব ছাড়া বাকি সব আমাদের নিজেদের সমাধানযোগ্য। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করে না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন না করে।" (সূরাঃ আর রা'দ, আয়াতঃ ১১)

ঘনবসতিপূর্ণ দেশের মানুষের সংখ্যা যত বেশি দৈনন্দিন সমস্যাও তত বেশি। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। তদুপরি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি সমস্যাগুলোকে আরো প্রকট করে তুলছে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে বিগত ৫০ বছরে রাজনীতিসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতগুলোতে শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়নি। সাধারণ জনগণের চেয়ে সমাজের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ বিশেষ করে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত সর্বজ্ঞানী শ্রেণির অবহেলা, অজ্ঞতা ও ব্যর্থতা এর জন্য দায়ী।

প্রবাদ আছে যেমন কর্ম তেমন ফল। আমাদেরও তাই হচ্ছে। স্কুল পাঠ্যপুস্তকে আমরা পড়েছি বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তখন এই নদীমাতৃক শব্দটির ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। এখন আমার মনে হয় মা যেমন তার বুকের দুধ পান করিয়ে তার আদরের ছোট্ট শিশুকে লালনপালন করে বড়, শক্তিশালী ও কর্মক্ষম করে তোলে, যার ফলে তার জীবন সুখময় হয়। তেমনিভাবে বাংলাদেশের নদীগুলো তার পানি ও প্রবাহের মাধ্যমে এদেশটিকে লালনপালন করছে। তাই আমার মনে হয় নদী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে।

বর্তমান বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যত চিন্তা-ভাবনা,পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড চলছে তা বাস্তবায়ন করলেও মনে হয় শতভাগ সফলতা আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নদীতে আবার প্রাণের পুনঃ জাগরণ না ঘটবে। পানিই জীবন। সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপদ পানির আবশ্যকতা ও উপকারিতা অতুলনীয়। নদী, খাল-বিলগুলো বাংলাদেশের নিরাপদ পানির প্রধান উৎস। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ বাস্তব সত্যটি অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই হয়ত দেশব্যাপী খালখনন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। আমরা তার এ দর্শন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। বর্তমান অবস্থায় শুধু খাল-বিল নয়, আমাদের নদীখনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। কাজটির দৃঢ় ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হলেও কালবিলম্ব না করে অচিরেই শুরু হওয়া উচিত। অনেকেই বলবেন ড্রেজার দিয়ে নদীখনন অত্যন্ত ব্যয়বহুল যা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা পরিষ্কার যে ড্রেজার পদ্ধতি অনুসরণ করে শুধু খরস্রোতা নদীখনন করা সম্ভব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের বড় বড় কয়টি নদী ছাড়া অন্যসব সব নদী, খাল-বিল পানিশূন্য হয়ে যায়। তাই এ শুকনো বা মরা নদী, খাল-বিলগুলো স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে খনন করার কোনো বিকল্প নেই। অতীতে অনেক দেশ যেমন চায়না ও বর্তমানে আফগানিস্তান তাদের পানি সংকট মোকাবিলায় নদী, খালবিলগুলোর খননে এ পদ্ধতি অবলম্বন করছে। মানুষের সাধ্যের বাহিরে কিছু নেই। তাই সঠিক পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন খুবই জরুরি। ১৯৭১ সাল এবং ২০২৪ সালে এ জাতি যেভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সফলতা অর্জন করেছে, তেমনি বাংলাদেশ রক্ষার্থে নদী, খাল-বিল খনন কর্মকাণ্ড বিশাল, কঠিন ও ব্যয়বহুল হলেও অসাধ্য কিছু নয়।

আমরা সবাই স্বনির্ভর সোনার বাংলা আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের আবহাওয়া, মাটি ও মানুষকে কাজে লাগিয়ে এটা অর্জন সম্ভব। প্রান্তিক জনগণ ও কৃষি খাত উন্নয়ন ছাড়া স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমার নিজস্ব একটি ভাবনা আছে। তা হচ্ছে নদী যেসব পাড়া বা গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে বয়ে গেছে বিশেষ করে বন্যাপ্রবণ এলাকা সেসব এলাকার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা উঁচু করে নির্মাণ করা উচিত যেন এ বাড়ি, স্থাপনাগুলো পরবর্তীতে বন্যা ও দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নদী খনন কার্যক্রমে সঠিক প্ল্যান অনুসরণ করে নদীগুলো ৮ ফুট গভীর, ৫ ফুট উঁচু ও ৪০ ফুট চওড়া করে দুই পাড় থাকবে। একপাশে ভূমিহীন ও নদীভাঙনে গৃহহীন বসতবাড়ি, গরু, ছাগল, হাঁস মুরগির পারিবারিক ছোট খামার থাকবে। আর অন্য পাড়ে গাছপালা, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, চলাচলের রাস্তা থাকবে। এপার থেকে ওপার যাওয়ার জন্য ২০২৪ ফিট অন্তর অন্তর এই নদীগুলোর উপর সাঁকো থাকবে। যা এপার ওপার চলাচলের সুযোগ তৈরি করবে। খননকৃত নদীগুলো জলাধার হিসেবে সেচকাজ, মৎস্য উৎপাদন ও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হবে ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে।

এদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও তার সফলতার অনেক নজির আছে যেমন- ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বৈরাচার পতন আন্দোলন ও বৈষম্যহীনবিরোধী আন্দোলন। বৈষম্যহীন পরিবেশবান্ধব স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে করণীয় নদীরক্ষা, নদী খনন ও সর্বক্ষেত্রে উৎপন্ন বৃদ্ধির আন্দোলন। আমাদের স্লোগান হোক, "নদী বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও, দেশ বাঁচাও"। নদী বাঁচলে, বাংলাদেশ বাঁচবে।